গল্প কল্প চিন্তা

আহমাদ ইউসুফ শরীফ

সঙ্কালন
প্রকাশনী

অর্পণ

প্রিয়তমা আহলিয়া।

দাম্পত্য জীবনের ১৭ বছরে যে শুধু দিয়ে গিয়েছে। ভালোবাসা, ত্যাগ-তিতিক্ষা আর সামলে নেয়ার অপরিশোধ্য ঋণে আমায় ঋণী করেছে। আমার অবহেলা, উদাসীনতা আর দীনতা যার আঁচলতলে প্রশ্রয় পেয়েছে। আমার মা-বাবার সন্তুষ্টি ও দুআ যাকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করে চলেছে।

আল্লাহ তাআলা তোমাকে সদা সুস্থ রাখুন। ঈমান, আমল, আখলাক, তাকওয়া, ইখলাস ও তাওয়াক্কুলে বরকত দান করুন। সন্তানদের তোমার চক্ষুর শীতলতা বানিয়ে দিন। নেক হায়াত দান করুন। দুনিয়া ও আখিরাতের প্রাচুর্যে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করুন। দুনিয়ার ক্ষুদ্র জীবনের পাশাপাশি জান্নাতেও আমাদের একসাথে রাখুন। আমীন!

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা **১১**

গল্প

জীবন থেকে নেওয়া কিছু গল্প **১৫**

১. আসমানি ফাইসালার হুমকি! ১৫
২. ভগবান তো মুদির দোকানে! ১৭
৩. দৌড়ে প্রথম হওয়ার শাস্তি! ২০
৪. সাঈদ আনোয়ার ও জামি'আর ছাত্রবৃন্দ ২২
৫. গ্রাম্য বৃদ্ধ ও সাঈদ আনোয়ার। ২৪
৬. উম্মতের হালত ও লাল মিয়া-কালা মিয়া ২৬
৭. মাকসাদ! ২৭
৮. একটি দরজা এখনো খোলা ২৯
৯. চালাক নাকি হালাক? ৩১
১০. আজেবাজে মোল্লা ৩৩
১১. আপনি কি মশারি টানান? ৩৪
১২. মাফিয়া ডনের কাছে দুআর দরখাস্ত! ৩৬
১৩. কিয়ামাতের সবচেয়ে বড় আলামত! ৩৮
১৪. অঙ্কে বড় কাঁচা! ৩৮

১৫. সবকিছু জানতে নেই ৪২
১৬. শিল্পপতি ও ভিখারি ৪৩
১৭. দল না দ্বীন? ৪৪
১৮. বেডসাইড টেবিল, স্মার্টফোন এবং ব্যাক স্ক্র্যাচার ৪৭
১৯. আমি নাকি ওল্ড স্কুল (Old school)! ৪৯
২০. লোভ, ভয়, নাকি ভালোবাসা? ৫৪
২১. স্মৃতির পাতায় আজম খান ৬১
২২. পাথরের দামে হীরা! ৬৪

কল্প

১. বক্তা ও দুষ্ট ছেলের দল ৮৩
২. বাতাসা গেল কই? ৮৫
৩. গুরু মারা শিষ্য ৮৭
৪. পড়বি তো পড় হুজুরের ঘাড়ে। ৮৯
৫. মাইকে কথা কয় কে? ৯০
৬. রাজনীতি নিয়ে রাজনীতি ৯১
৭. উচিত শিক্ষা ৯২
৮. আমার কোনো দোষ নেই কেন? ৯৪

চিন্তা

বিয়ে, দাম্পত্য, সংসার ৯৫

১. বিয়ে কেন করবেন, কখন করবেন? ৯৫
২. বিয়েশাদিতে সহযোগিতা: যৌতুকে নয়, মোহরানা ও ওয়ালিমায়। ৯৮
৩. দাম্পত্য জীবনে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নিজের দায় বুঝা। ১০২
৪. মাইনের টাকা বউয়ের হাতে! বোকামি নাকি চালাকি? ১০৫

৫. একান্নবর্তী পরিবারে পোশাকের সতর্কতা ১০৭
৬. নারীর গায়রত (আত্মমর্যাদাবোধ) ও বরকত ১০৮
৭. ডিজিটাল দাইয়ুস ১০৮
৮. সর্বকনিষ্ঠ নানি ও মেয়েদের পর্দার বয়স!!! ১০৯
৯. স্বামী ও স্ত্রী একসাথে জান্নাতে থাকা
সম্পর্কিত কিছু প্রশ্নের উত্তর। ১১০
১০. সন্তানকে গড়ে তুলুন ১১৫

চরিত্র গঠন **১১৭**

১. দ্বীনের চাদরে মোড়ানো খাহেশাত (পার্থিব লালসা) ১১৭
২. পুরুষের জন্য নারীকেন্দ্রিক ফিতনার ভয়াবহতা ১১৮
এক. নারীকেন্দ্রিক ফিতনায় শয়তানের ভূমিকা। ১২০
দুই. বিপরীত লিঙ্গের প্রতি সৃষ্টিগত মানবিক দুর্বলতা। ১২৪
তিন. ইসলামের শত্রুদের ভূমিকা। ১২৭
চার. নারীকেন্দ্রিক ফিতনার ভয়াবহতা এবং তার অপকারিতা। ১৩২
৩. কথা নিয়ে কিছু কথা ১৩৭
মুখের ভাষা : আল্লাহ্ তাআলার দেয়া এক বিশাল নিআমাত ১৩৭
সমস্ত কথা চার প্রকার। ১৩৮
নীরবতা হিরণ্ময় ১৩৯
অতিরিক্ত কথা বলা থেকে নিবৃত্ত থাকা চাই ১৪২
অনর্থক কথাবার্তা পরিত্যাগ করা চাই ১৪৮
৪. মানুষের মনে এত দুঃখ কেন? ১৫১
৫. ৯টি রোগ ও এর চিকিৎসা ১৫২
৬. যাদের কাছে মাফ চাওয়া হয়নি ১৫৩

আকিদা, বিশ্বাস ও আমল **১৫৪**

১. কে হবে আমার শায়খ? ১৫৪
২. ‘কুরআন তিলাওয়াতের অন্যতম ৫ উদ্দেশ্য’ ১৫৬

৩. রমযান : শুধু ইবাদাতে নয়, যুহদ হোক
খাওয়া-দাওয়া এবং পোশাক-আশাকেও ১৬১
৪. ইসলাম ও মানবতা-বিরোধীদের মৃত্যু এবং আমাদের করণীয় ১৬২
৫. বহুল আলোচিত "لَيْسَ مِنَّا" 'লাইসা মিন্না'
তথা 'সে বা তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়' বাক্যটির ব্যাখ্যা ১৬৯

লেখকের ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلُلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

হামদ, ছানা, দরুদ আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের কালাম পাঠের পর,

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٣٥﴾

‘আর তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, (নিজে) সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলমান? ভালো ও মন্দ সমান নয়। আপনি (বিরোধীদের) জবাবে তা-ই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন, আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর এমন চরিত্র তারাই

লাভ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে, এবং এমন চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।'[১]

তিনি আরও বলেন,

اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ وَالۡمَوۡعِظَۃِ الۡحَسَنَۃِ وَجَادِلۡهُمۡ بِالَّتِیۡ هِیَ اَحۡسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِیۡلِهٖ وَهُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُهۡتَدِیۡنَ

'আপনি আপন পালনকর্তার পথের প্রতি জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে (হিকমাত) ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে দাওয়াত দিন এবং উত্তম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করুন। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে, এবং তিনিই ভালো জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।'[২]

অন্যত্র তিনি বলেন,

فَسِیۡحُوۡا فِی الۡاَرۡضِ اَرۡبَعَۃَ اَشۡهُرٍ وَّاعۡلَمُوۡۤا اَنَّکُمۡ غَیۡرُ مُعۡجِزِی اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخۡزِی الۡکٰفِرِیۡنَ

'অতঃপর তোমরা (চুক্তির সময়ে) জমিনের বুকে চার মাস পরিভ্রমণ করো। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদিগকে লাঞ্ছিত করে থাকেন।'[৩]

তামীম দারী রা. বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اَلدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

'(সদুপদেশের মাধ্যমে) কল্যাণ কামনাই দ্বীন। আমরা আরয করলাম, কার জন্য কল্যাণ কামনা? তিনি বললেন, 'আল্লাহ, তাঁর কিতাবের,

[১] সূরা ফুসসিলাত/হা-মীম সিজদা, ৪১ : ৩৩-৩৫
[২] সূরা সূরা নাহল, ১৬ : ১২৫
[৩] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭০, ৭১

তাঁর রাসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের।”[৪]

উপরি-উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. বলেন, ‘এই হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদল আলিমের মতে, এই হাদীসের বাণীটি ইসলামের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ যে চার হাদীসের ওপর দ্বীনের সমস্ত বিষয় নির্ভর করে, তন্মধ্যে এই হাদীসটিও একটি হাদীস।’[৫]

একই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু দাকীকীল ঈদ রহ. বলেন, ‘নসীহাত তথা সদুপদেশ প্রদান করা ‘ফারযুল কিফায়া’ পর্যায়ের দায়িত্বপূর্ণ ইবাদাত। উপযুক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে তা আদায় করা গেলে অন্যরা এ থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবেন। এবং প্রয়োজন অনুসারে উপদেশ প্রদান করা উম্মাহর দায়িত্বও বটে।’[৬]

প্রিয় পাঠক, দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিষয়ে উপদেশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সর্বজনস্বীকৃত বিষয়। আর সেই উপদেশ যদি উপমা-উদাহরণের মাধ্যমে হয়; কুরআন, হাদীস ও আছারের মাধ্যমে হয়—তবে তো সোনায় সোহাগা।

অধম গুনাহগার নিজেই উপদেশের মুখাপেক্ষী, সেখানে অন্যকে উপদেশ দেয়া আমার জন্য বেশ বাড়াবাড়িই বটে। তবে এ ক্ষেত্রে সাহাবী আনাস ইবনু মালিক রা.-এর একটি বর্ণনা আমাকে আশা জুগিয়েছে। তিনি বলেন,

> قُلْنَا :يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ حَتّٰى نَعْمَلَ بِه كُلِّه، وَلَا نَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى نَجْتَنِبَهُ كُلَّهُ؟ فَقَالَ ﷺ : بَلْ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا بِه كُلِّه، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبُوْهُ كُلَّهُ
>
> ‘আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যাবতীয় বিধিবিধানের ওপর আমল করার আগ পর্যন্ত আমরা অপরকে সৎকাজের আদেশ করব না এবং সমস্ত গুনাহ পরিত্যাগ করার আগে আমরা অপরকে অসৎকাজের নিষেধ করব না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘যদি সব বিধান পালন করতে নাও পারো, তারপরও তোমরা সৎকাজের আদেশ করো। সব গুনাহ পরিত্যাগ না

---

[৪] সহীহ মুসলিম : ৫৫।

[৫] শরহুন নববী আলা মুসলিম : ২/৩৭।

[৬] শরহুল আরবাঈন : ৫২।

করতে পারলেও তোমরা অসৎকাজের নিষেধ করো।”[৭]

বক্ষ্যমাণ বইটি মূলত তিন ধরনের আলোচনায় সাজানো। (১) দাওয়াত ও তাবলীগসহ বিভিন্ন দাওয়াতী সফর ও দ্বীনি কারগুজারি। (২) আমাদের শিক্ষাজীবনে কাছ থেকে দেখা কিছু মজার ঘটনা। এবং (৩) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে লেখা আমার কিছু প্রবন্ধ। এসব লেখার মধ্যে বিয়ে, দাম্পত্য, সংসার, চরিত্র গঠন ও আকিদা, বিশ্বাস ও আমল বিষয়ে অধমের কিছু কথাবার্তা তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্য এসব আলোচনার ক্ষেত্রে আমি সাধ্যানুযায়ী কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফের মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

এসব ঘটনা ও আলোচনার মাধ্যমে আমাদের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, করণীয়-বর্জনীয় ও যাপিত জীবনের রসবোধ ইত্যাদি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এসব ঘটনা ও আলোচনায় আমাদের জন্য শেখার এবং নেয়ার মতো কিছু আছে বলে আমার সুধারণা।

সঞ্চালন প্রকাশনীর প্রতি আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তারা আমার মতো দুর্বল কলমের ব্যক্তির লেখনীকে ছাপার অক্ষরে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের পথচলাকে সব সময় সহজ রাখুন। সীরাতুল মুসতাকীমের ওপর রাখুন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ব্যক্তি হিসেবে আমার আমলে যেমন ভুলত্রুটি রয়েছে, তেমনিভাবে চিন্তাভাবনা ও উপস্থাপনেও ভুল থাকা খুবই স্বাভাবিক। কোনো প্রাজ্ঞ পাঠকের বিজ্ঞ দৃষ্টিতে অধমের কোনো ভুলত্রুটি ধরা পড়লে জানানোর বিনীত অনুরোধ। জাযাকুমুল্লাহু ফিদ দারাইন।

আহমাদ ইউসুফ শরীফ
উত্তরখান, ঢাকা-১২৩০
২৫-১২-১৪৪৩ হি. মোতাবেক
১০-০৪-১৪২৯ বঙ্গাব্দ মোতাবেক
২৫-০৭-২২ ইং.

[৭] তাবরানী, মু’জামুল আওসাত : ৬/৩৬৫ [৬৬২৮]। সনদ দুর্বল।

গল্প

জীবন থেকে নেওয়া কিছু গল্প

১. আসমানি ফাইসালার হুমকি!

গত শতকের ৯০ এর দশকের ঘটনা।

সবুজ মিয়া একজন বেবিট্যাক্সি চালক। সংসারে বৃদ্ধা মা, স্ত্রী আর চার ছেলে মেয়ে। থাকেন পুরোনো ঢাকার আরমানিটোলার এক খুপরি ঘরে। সারাদিন বেবিট্যাক্সি চালিয়ে যে সামান্য আয় রোজগার হয়, তাই দিয়ে টানাটানির সংসার চলে যায় কোনোরকম। এদিকে বেশ কিছুদিন যাবৎ দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের বরকতে পরিবারে দ্বীনদারির ছোঁয়া লেগেছে। মা ও বিবি শরঈ পর্দা শুরু করেছেন। ছেলে-মেয়েরা মাদরাসায় পড়ছে। ঘরে তালিম হয়। এলাকার তালিমের পয়েন্টে যাওয়া আসা হয় । অভাবের সংসারে অভাব ঠিকই রয়ে গেছে। কিন্তু অভিযোগ অনুযোগ দূর হয়ে গেছে। আফসোস আর হাহাকার বিদায় নিয়েছে। কর্মক্ষম মাহরামের সামান্য আয় নিয়েই সবাই অল্পেতুষ্টির জীবনযাপন করছেন। ফরজ ও ওয়াজিব ইবাদাতের পাশাপাশি নফল সালাত, তিলাওয়াত ও যিকির-আযকার বেড়ে গেছে। সব মিলিয়ে সবাই খুশি।

এই অল্পেতুষ্টির সংসারে আরেকটু তৃপ্তি এনে দিতে সবুজ মিয়া সপ্তাহে এক দিন এক কেজি গরুর গোশত কিনে আনেন। সবাই মিলে শুকরিয়া ও ইকরামের সাথে তা গ্রহণ করেন। প্রতি শুক্রবার, সবুজ মিয়া এক কেজি গোশত কিনে আনেন। হুজুরের মুখে শুনেছেন, শুক্রবার সাপ্তাহিক ঈদ।

কসাইয়ের পাষাণ মনে হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগল! লোকটা এটা কী বলল? কার ভয় দেখাল সে? সে যদি বাজার কমিটির ভয় দেখাত, তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না। বাজার কমিটি আমরা বানিয়েছি। কমিশনারের ভয় দেখালেও কোনো সমস্যা ছিল না। কমিশনার আমাদের লোক।

কিন্তু সে তো এমন একজনের ভয় দেখাল, 'যিনি না ধরলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ধরে ফেললে ছাড়িয়ে নেওয়ার কেউ নেই।'

কসাইয়ের মনে পড়ল, সেও হুজুরের মুখে শুনেছে, নিশ্চয়ই তোমার রবের পাকড়াও বড় মজবুত। তিনি নমরুদ, ফিরআউন, হামান, কারুন আর আবু জেহেলকে ধরেছিলেন। কেউ ছাড়াতে পারেনি।

কসাই দোকান থেকে নেমে এসে সবুজ মিয়াকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিলো। বলল, 'ভাইজান, ভুল অইয়া গেছে। মাফ কইরা দেন। আর কোনো সময় কারও লগে এমন ভুল অইব না।'

সেই কসাই আর সবুজ মিয়া এখন একসাথে দ্বীনের মেহনত করেন।

২. ভগবান তো মুদির দোকানে!

১৯৮৯ সাল। সুমন মিস্ত্রি। স্ত্রী নীতা বালা আর এগারো বছর বয়সি ছেলে রাজন। নিম্নবর্ণের হিন্দু পরিবার। নিম্নবিত্তও বটে। দিন আনে দিন খায়। সামান্য ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ করে কোনোরকম সংসার চলে। কোনোদিন কাজ থাকে, কোনোদিন থাকে না। যেদিন কাজ থাকে সেদিনের হাজিরাও আবার নিশ্চিত নয়। হাজিরার টাকা পেলে রফিক হাজীর দোকান হতে নগদ টাকায় বাজার-সদাই করা হয়। হাজিরা না পেলে বাকিতে সদাই নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। হাজী সাহেব নিতান্ত ভালো মানুষ বলেই এ রকম অনিশ্চিত একজন লোককে বাকিতে সদাই দেন। অন্য কেউ দিতে চায় না। নিজের জাত ভাইয়েরাও না। জাত ভাইয়েরা তো ধর্মটাই তাদের সাথে মিলেমিশে পালন করতে দেয় না।

অভাবের সংসারে শখ-আহ্লাদের বলি চড়িয়ে কেটে যাচ্ছিল জীবনের দিনগুলো। বিপত্তি বাধল হঠাৎ এক মৌসুমি জ্বরে।

জ্বরে কাতর সুমন মিস্ত্রি, দুইদিন হলো বিছানায় শোয়া। চিকিৎসা বলতে সরকারি হাসপাতালের প্যারাসিটামল আর বউয়ের সেবাযত্ন। কাজ বন্ধ। রোজগার বন্ধ। বন্ধ বাজার-সদাই। তিনদিনের মাথায় উনুনে চাপানোর মতো ঘরে আর কিছু নেই।

পতিদেব বেঘোর জ্বরে বেখবর। নীতা বালার কপালে দুশ্চিন্তার ঘাম জমতে শুরু করেছে। আজ কী হবে? পাতে কি কিছু পড়বে? এই অসুস্থ মানুষটা আর বাচ্চা ছেলেটা না খেয়ে থাকবে? সাতপাঁচ ভেবে চুলার পারের তাক থেকে পুরোনো বৈয়ামটা নামিয়ে খুলে ফেলল নীতা। ভিতরে উঁকি মেরে খানিকটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল সে। যাক পঞ্চাশ টাকার একটা পুরোনো নোট দেখা যাচ্ছে। আজকের দিনটা পার করে দেওয়া যাবে। অতি যত্নে নোটটা বের করে ছেলেটাকে ডাকল, ‘রাজন! ও রাজন!’

রাজন আসতেই স্কুলের কড়া শিক্ষিকার মতো নীতা ছেলেকে বুঝাতে লাগল, ‘এই পঞ্চাশ টাকাটা প্যান্টের পকেটে ভর। পকেটে ভইরা পকেটে হাত দিয়া রাখবি। রফিক হাজীর দোকানে ঢুকার আগে কিন্তু হাত বাহির করবি না। দোকানে ঢুইকা টাকাটা হাজী সাবরে দিবি। দিয়া এক কেজি চাইল আর এক পোয়া ডাইল নিয়া সোজা বাড়িত আয়া পড়বি। এদিক ওদিক কোনোদিক কিন্তু যাবি না, বাবু।’

ছেলে মাথা নেড়ে মায়ের কথায় সায় দিয়ে টাকা নিয়ে ছুটল। হাজী সাবের দোকানে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে টাকাটা বের করে হাজী সাহেবের সামনে মেলে ধরে বলল, ‘এক কেজি চাইল আর এক পোয়া ডাইল দেন’।

রফিক হাজী রাজনের দিকে তাকিয়েই বুঝলেন, কোথাও কোনো সমস্যা হয়েছে। তিনি টাকা না নিয়ে প্রশ্ন করলেন,

‘তোর বাপ কই? অরে দেহি না তিনদিন ধইরা। ঘটনা কী?’

‘বাবায় বিছানাত পইড়া আছে। তিনদিন ধইরা জ্বর। মায় পাডাইছে এই টাকা দিয়া সদাই নিতে।’

হাজী রফিক দ্বীনদার মানুষ। দ্বীনের মেহনত ও ফিকির নিয়ে চলা মানুষ। সব শুনে তিনি মিনিট খানেক চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। সামনে সুমন মিস্ত্রির ছেলে রাজন পুরোনো পঞ্চাশ টাকার একটা নোট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

খানিক পর হাজী সাহেব চোখ খুলে দোকানের কর্মচারী নবু মিয়াকে ডাকলেন,

‘নবু, একটা টুকরি ল। দশ কেজি চাইল, দুই লিটার তেল আর এইডা এইডা ল।’ নবু মিয়া টুকরিতে সব জমা করল। হাজী সাহেব ক্যাশ থেকে ১৫০ টাকা বের করে নবুর হাতে দিয়ে বললেন, ‘এই টাকা দিয়া কিছু মাছ লইয়া আয় যা।’

নবু বেরিয়ে গেল। রাজন আবার বলল, ‘আমার চাইল আর ডাইল দিবেন না?’

‘আরে বেডা দিমু। এত তাড়াহুরা করস কে? মাত্র বাজে সকাল ৯টা। তোর মায় কি এহনি রানব?’

‘না , এহন রানব না। তয় মায় চিন্তা করব।’

‘চিন্তা করব না। তুই বয়। আইসক্রিম খাবি? একটা আইসক্রিম আনায়া দেই?’

রাজন ভয়, লোভ আর বিস্ময়মাখা চোখে হাজী রফিকের দিকে তাকিয়ে রইল।

হাজী সাহেব আইসক্রিম আনিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে নবু মিয়া মাছ নিয়ে হাজির।

হাজী সাহেব নবুর হাতে আরও দুই শ টাকা দিলেন। দিয়ে বললেন, ‘এই বাজার-সদাই লইয়া এই ছ্যাড়ার লগে গিয়া বাড়িত দিয়া আয়। বাড়ির দরজায় মাল নামায়া দিয়া টাকা দুই শ পোলাডার হাতে দিয়া তুই আয়া পড়বি।’

রাজন চোখ বড় বড় করে একবার হাজী সাহেবের দিকে দেখে। একবার বাজার-সদাইয়ের দিকে। হাজী সাহেব ছেলেটার দিকে তাকিয়ে একটু হাসি দিয়ে বললেন, ‘অর লগে বাইত যা। বাজার আর টাকা তোর মারে দিবি। আর তোর বাপেরে কইবি ভালা হইলে আমার লগে দেখা করতে। যা।’

নবু মিয়া বাড়ির দরজায় সব নামিয়ে দিয়ে টাকা দুই শ রাজনের হাতে গুঁজে দিয়ে চলে এল।

রাজন চিৎকার করে মাকে ডাকতে লাগল। নীতা বালা বেরিয়ে এসে এত বাজার-সদাই দেখে হকচকিয়ে গেল। নিজেকে খানিকটা সামলে বলল, ‘এইডি কী? এইডি কইত্তে আনছোস তুই?’

‘হাজী সাব পাডাইছে। বাবার অসুখ শুইন্না দোকানের লোক দিয়া এইডি পাডাইছে। তোমার পঞ্চাশ টাকা নেয় নাই। আরও দুই শ টাকা দিছে। বাবায় ভালা হইলে দেখা করতে কইছে। আমারে একটা আইসক্রিমও খাওয়াইছে।’

সব শুনে নীতা বালা দরজাতেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। চিন্তার জগৎ এলোমেলো হয়ে গেছে তার। চোখের কোণে জল জমতে শুরু করছে।

খানিকটা ধাতস্থ হয়ে সবকিছু ভেতরে নিয়ে রেখে স্বামীর কাছে গিয়ে বসল।

ধরে আসা গলায় বলল, ‘সাপ্তায় সাপ্তায় মন্দিরে যাইয়া ভগবানরে ডাকি। ভগবান তো মন্দিরে নাই। ভগবান তো মুদির দোকানে!’ বলেই কান্নায় ভেঙে পড়ল। এ কান্না যেন সহজে থামবার নয়।

সপ্তাহ খানেক পর। হাজী রফিক সাহেবের বাসায় তিনজন মানুষের নাম পাল্টে দেওয়া হলো। আব্দুল্লাহ, আমিনা ও মুহাম্মাদ।

৩. দৌড়ে প্রথম হওয়ার শাস্তি!

২০০৭ সাল। বারিধারা। প্রেসিডেন্ট পার্ক। মরহুম রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের বাসভবন। এরশাদ সাহেব সোফায় বসে আছেন। সামনের সোফায় আরও পাঁচজন বসা। একজন মাওলানা। একজন কার্ডিয়াক সার্জন। অন্য তিনজন আরব মেহমান। শেখ আব্দুল কাদির। প্রফেসর, জেদ্দা ইউনিভার্সিটি। শেখ আইমান। প্রফেসর, মদীনা ইউনিভার্সিটি। শেখ ফাহাদ ইবনু আওদা সাকাফী। মদীনার সাবেক ডিআইজির ছেলে। তাইফের বিখ্যাত সাকীফ গোত্রের মানুষ।

প্রেসিডেন্ট পার্কে আসার উদ্দেশ্য সাবেক রাষ্ট্রপতির নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো। সালাম, মুসাফাহা ও কুশল বিনিময়ের পর অনুবাদকের সাহায্যে কথা শুরু করলেন ফাহাদ ইবনু আওদা সাকাফী।

‘স্যার, আপনার ২০/২২ বছর বয়সের কোনো ছবি আছে কি?’

‘আছে তো। ওই তো আপনার পিছে।’

(পিছনে ফিরে ছবিটি দেখে) ‘ও আচ্ছা আচ্ছা! এটা আপনার ছবি? মাশা আল্লাহ। যৌবনে আপনি কী সুন্দর, সুঠাম, উচ্ছল, প্রাণবন্ত আর টগবগে তরুণ ছিলেন!’

‘ধন্যবাদ। আসলে এসব আর এখন ভেবে বা বলে কী লাভ বলুন?’

‘ঠিক বলেছেন। আচ্ছা আপনি এই ছবিটি দিনে ক’বার দেখেন?’

'প্রথম যখন টাঙিয়েছিলাম তখন প্রায়ই দেখতাম। তবে এখন আর তেমন দেখি না। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। তবে ফিলিংস আসে না।'

'বলেন কী? এই ছবিটা তো আপনার দৈনিক ২০ বার দেখা উচিত।'

'এটা আবার কী ধরনের কথা? হুজুররা তো ছবি তুলতেই নিষেধ করেন। তা ছাড়া আমি শুনেছি, দৈনিক ২০ বার মৃত্যুকে স্মরণ করতে হয়।'

'আপনি হয়তো সঠিক শুনেছেন। তবে আমি বলতে চাচ্ছি, আপনি ছবিটা দেখবেন আর ভাববেন, একসময় কী দুরন্ত আর দুর্দান্ত যুবকই না ছিলেন আপনি! যৌবনের দ্যুতি তখন আপনার দুচোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসত। অথচ দুনিয়ার পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে আজ আপনি বার্ধক্যের জীর্ণদশায় এসে হাজির। চেহারায় ভাঁজ পড়ে গেছে। চোখের জ্যোতি লোপ পেয়েছে। গলার স্বর নেমে গেছে। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ হাতছাড়া হয়ে গেছে।'

(এরশাদ সাহেব দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) 'হুম... ঠিক বলেছেন। সময় ফুরিয়ে গেছে। যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

'সময় সবারই ঘনিয়ে এসেছে, স্যার। তবে আপনি চাইলে আপনার জীবনের কথা বলে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারেন।'

'আমার জীবনে আসলে মানুষকে ধর্মের পথে ডাকার মতো কোনো অর্জন বা কৃতিত্ব নেই।'

'তা হয়তো আমারও নেই। কিন্তু আমরা আমাদের ভুলের ইতিহাস বলেই মানুষকে সঠিক পথের দাওয়াত দিতে পারি।'

'সেটা কীভাবে?'

'যেমন মনে করেন, আপনি মানুষের কাছে গিয়ে এই কথা বললেন যে, দেখো ভাই, আমি তোমাদের প্রেসিডেন্ট ছিলাম। অর্ধযুগেরও বেশি সময় আমি তোমাদের রাষ্ট্রপতি ছিলাম। রাষ্ট্রপতি মানে দেশের প্রথম নাগরিক। ফার্স্ট পারসন। এজন্যই প্রেসিডেন্টের স্ত্রীকে বলা হয় ফার্স্ট লেডি। তো তোমাদের মধ্যে দুনিয়ার পিছনে দৌড়ে আমি দীর্ঘদিন প্রথম ছিলাম। অর্ধযুগেরও বেশি সময় এই দৌড়ে প্রথম হয়েও আমি দুনিয়ার নাগাল পাইনি; বরং এই দৌড়ে প্রথম হওয়ার

কারণে আমাকে জেল-জুলুমের শিকার হতে হয়েছে। রাজনৈতিক পরিহাসের শিকার হতে হয়েছে। এখনো নানাভাবে হেনস্থা হচ্ছি।

আর তোমরা তো এই দৌড়ে কেউ দুই কোটি নম্বর। কেউ পাঁচ কোটি নম্বর। তোমরা আর কী পাবে? খামোখা এসব দৌড়ঝাঁপ বন্ধ করে আখিরাতের দিকে দৌড়াও। আল্লাহর দিকে দৌড়াও। দ্বীনের পথে দৌড়াও।'

এরশাদ সাহেব অবাক হয়ে বাংলাদেশি কার্ডিয়াক সার্জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই লোককে আপনি কোথায় পেলেন? এমন কথা তো আমি জীবনে শুনিনি। কেউ কখনো আমাকে বলেনি!'

ইতিমধ্যে এরশাদ সাহেবের বাসায় কর্মরত দুজন গারো উপজাতি গোষ্ঠীর যুবক মেহমানদের সেবায় সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একপর্যায়ে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে তারা আপন রবের পরিচয় না জেনে শিরকে জড়িয়ে আছেন। ফাহাদ সাকাফির আরও কিছুক্ষণ দাওয়াতের পর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য হিদায়াতের দরজা খুলে দেন। দুজনই গোসল করে এসে পাঠ করেন, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

ফাহাদ সাকাফি এরশাদ সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনার রাজত্বকালীন পুরো সময়ের অর্জনের চেয়েও এই দুই যুবকের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যম হওয়ার মূল্য অনেক অনেক এবং অনেক বেশি।'

মরহুম রাষ্ট্রপতির চেহারায় দৌড়ে প্রথম হওয়ার শান্তির বিস্বাদ ছাপিয়ে ততক্ষণে আনন্দের ঝিলিক দেখা গেল। তিনি টিস্যু পেপার দিয়ে দুচোখের কোণে অযাচিতভাবে জেঁকে বসতে চাওয়া কিছু একটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করলেন।

৪. সাঈদ আনোয়ার ও জামি'আর ছাত্রবৃন্দ

২০০৮ সাল। বিশ্ব ইজতিমার বিদেশি মেহমান কামরায় বিশ্ববরেণ্য আলিম ও মুবাল্লিগদের পাশাপাশি আলো ছড়াচ্ছেন কিছু দুনিয়াবী তারকা। নাপাক নাচিজ দুনিয়ার মোহে যারা জীবনের সিংহভাগ সময় পার করে দিয়েছেন। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রতিভার দ্যুতি ছড়িয়ে কেড়ে নিয়েছেন গণমাধ্যম ও গণমানুষের বিশেষ আকর্ষণ। তবে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত মেহেরবান এক সত্তা। নাপাক

দুনিয়ার মিথ্যা হাতছানি আর যশ-খ্যাতির মরীচিকা ভেদ করে তাদেরই গুটিকয়েক মানুষকে তিনি আলোর সন্ধান দিয়েছেন। জীবনের হাকীকত বুঝে আখিরাতের সাফল্যমণ্ডিত রাজপথে হাঁটার সৌভাগ্য দান করেছেন।

পাকিস্তান জাতীয় দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যান, সাঈদ খান আনোয়ার সেই সৌভাগ্যবান গুটিকয়েক মানুষের একজন। বিশ্ব কাঁপানো বাঁ-হাতি হার্ডহিটার উইলো ছেড়ে জায়নামাজ আর তাসবীহ তুলে নিয়েছেন হাতে। দাওয়াতের কাজকে বাকি জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে পাল্টে নিয়েছেন জীবনের সফরসূচি।

দাওয়াতের এই সফরনামা চলতে চলতে ২০০৮ সালে নোঙর ফেলে বাংলাদেশে। এর আগে কতবার এসেছেন! ৯৭-৯৮ ক্রিকেটবর্ষে ঢাকার মাঠে রোজা রেখে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে কুড়িয়েছেন প্রশংসার ফুলঝুরি।

তবে এবারের সফর ভিন্ন। বাইশ গজের সীমানা পেরিয়ে লক্ষ্য এখন কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা উম্মতে মুহাম্মাদির ফিকির। এসেছেন বিশ্ব ইজতিমায়।

সাথে আছেন স্বল্প পরিচিত এক সময়ের উইকেট কিপার জুলকারনাইন। আরও একজন আছেন। পাকিস্তান পপ সংগীত জগতের মুকুটহীন সম্রাট, মরহুম জুনাইদ জামশেদ রহ.।

বৃষ্টি-বিঘ্নিত ইজতিমা একদিনেই শেষ হয়ে গেলে, মুনাজাত সেরে মাওলানা তারিক জামিল হাফিজাহুল্লাহ-সহ ছোট এক কাফিলার সাথে উত্তরার এক সাথি ভাইয়ের বাসায় ওঠেন। পরদিন কাকরাইলে তার সংক্ষিপ্ত সফরসূচি তৈরি করে দেওয়া হয়। কলেজ, ভার্সিটি আর ক্রিকেট ক্লাবের পাশাপাশি সফরনামায় কয়েকটি জামি'আর নামও স্থান পায়।

বিভিন্ন সফরের ফাঁকে সাঈদ আনোয়ারের জামাত গিয়ে উঠল ঢাকার বিখ্যাত এক জামি'আয়। জোহর বাদ সাঈদ আনোয়ার কথা বলবেন। বিদ্যুদ্‌বেগে চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল। নামাজের পর মসজিদ টইটম্বুর। তিল ধারণের জায়গা নেই। ছাত্রদের মাঝে চাপা গুঞ্জন! এই যে সাঈদ আনোয়ার! ওই তো সাঈদ আনোয়ার!

তিনি বয়ানের জন্য মিম্বরে বসলেন। হামদ ও ছানার পর যা বললেন, তা শোনার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না।

তিনি বললেন, ‘যশ আর খ্যাতির পিছে ছুটতে ছুটতে আমার একটি বদ অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। কোথাও গেলে লোকজন আমাকে চিনলে, আমাকে নিয়ে মাতামাতি করলে, হৈ-হুল্লোড় করলে ভালো লাগে। মনের কোনো এক কোণে তৃপ্তির ঢেউ আছড়ে পরে। কিন্তু আজকে প্রথম আমার কাছে খুব খারাপ লাগল। মনে ব্যথা পেলাম! আফসোস হচ্ছে!

আপনারা তালিবুল ইলম। কিতাব আর দরস আপনাদের নেশা। উম্মতের হালত আপনাদের পেরেশানী। দুনিয়াদাররা আপনাদের নিকট বর্জনীয়। দুনিয়ার লাইনে খ্যাতি পাওয়া লোকজন আপনাদের অচেনা অজানা।

সেই আপনারা আমাকে চিনলেন কীভাবে? আমার চেহারা দেখেই আপনারা আমাকে কীভাবে চিনে নিলেন? আমাকে নিয়ে ফিসফাস আর উচ্ছ্বাসই বা কীভাবে প্রকাশ করলেন?

এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এক নাপাক আর ইমান বিধ্বংসী জগতের সাঈদ আনোয়ার, তালিবুল ইলমদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে না। আপনারা যদি এই ভুলে ডুবে থাকেন, উম্মতের জন্য তাহলে বিরাট মুসীবত অপেক্ষা করছে।’

এরপর তিনি তার স্বাভাবিক দাওয়াতি কথাবার্তা শুরু করেন।

উস্তাদ, অভিভাবক আর মাদরাসার নিয়ম-কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ক্রিকেট নিয়ে মেতে থাকা আমাদের মাথায় ততক্ষণে কেউ একজন শত মণ ওজনের পাথর বেঁধে দিয়েছে। ওপরের দিকে ওঠানোর কোনো জো নেই।

৫. গ্রাম্য বৃদ্ধ ও সাঈদ আনোয়ার।

সাঈদ আনোয়ার। ক্রিকেট বিশ্বের সুপারস্টারদের একজন। কব্জির মোচড়ে ক্রিকেট ভক্তদের হৃদয় জয় করে নেয়া বাঁ-হাতি ক্রিকেটার।

জীবনের কঠিন এক বাঁকে এসে উইলো রেখে হাতে তুলে নেন তাসবীহ। প্যাভিলিয়ন আর ড্রেসিংরুমের মায়া কাটিয়ে উঠে আসেন মসজিদের ঠিকানায়। বাইশ গজের সীমানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন দাওয়াত ও তাবলীগের বিশ্বজোড়া মেহনতের ময়দানে।

এমনি এক সফরে বেরিয়ে একবার ছুটে বেড়াচ্ছেন শহর-বন্দর। একবার গ্রাম-গঞ্জ। ছুটতে ছুটতে কাফেলা এসে থামল এক গ্রামীণ মসজিদে। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে উপমহাদেশীয় আলস্য নিয়ে শুয়ে আছেন মসজিদের এক কোণে। অদূরেই শুয়ে আছে এক গ্রাম্য বৃদ্ধ। যার কাছে সাঈদ আনোয়ারের তারকাখ্যাতির কোনো মূল্য নেই। তিনি এসব বুঝেন না। তবে এতটুকু বুঝেন, লোকটা নামীদামি কেউ। অন্যদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

একপর্যায়ে সাঈদ আনোয়ারকে লক্ষ্য করে বৃদ্ধ বললেন, 'বেটা, ঘুমিয়ে পড়েছ?'

'জি না চাচা, বলেন।'

'একটা কথা বলব?'

'জি, জি, বলেন।'

'কিন্তু শুনতে হলে উঠে বসতে হবে। দামি কথা। গুরুত্ব সহকারে শুনতে হবে।'

সাঈদ আনোয়ার আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলেন।

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন,

'বেটা, সামান্য মজার জন্য কোনো গুনাহ্ করবে না। এই মজাটা অল্পতেই ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু গুনাহটা তোমার জীবনে কুপ্রভাব ফেলবে। আমলনামায় রয়ে যাবে। আল্লাহ না করুন, যদি এই গুনাহ্ মাফ না করিয়েই তুমি মারা যাও, তাহলে গুনাহটা তোমার কবরে বিপত্তি বাধাবে। হাশরের মাঠে কঠিন পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেবে। মীযানের পাল্লায় দুশ্চিন্তার কারণ হবে। এমনকি এই একটি গুনাহই তোমাকে জাহান্নামের আগুনে ফেলতে পারে।

এমনিভাবে সামান্য কষ্টের ভয়ে কোনো নেক আমল ছেড়ে দেবে না। এই কষ্টটা বেশিক্ষণ থাকবে না। কিন্তু এই আমল তোমার জীবনে উত্তম প্রভাব বিস্তার করবে। কবরে প্রশান্তি ডেকে আনবে। হাশরের মাঠে শান্তির পরশ দেবে। মীযানের পাল্লায় ভরসা জোগাবে। এমনকি হতে পারে, এই একটি আমলের বরকতে তুমি জান্নাতে যাবে।'

সাঈদ আনোয়ার এক বয়ানে বলেন, 'আমার পুরো জীবনে কেউ আমাকে এরচেয়ে দামি কোনো নসীহত করেননি।'

৬. উম্মতের হালত ও লাল মিয়া-কালা মিয়া

১৯৭৩ সাল। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ। উত্তর সীমান্তের পঞ্চগড় জেলা তখনো জেলা হয়নি। দিনাজপুরের মহকুমা। নাম পচাঁগড়। ঢাকা কাকরাইল হতে চিল্লার জামাত গিয়ে হাজির। জালাসি মসজিদের আঙিনায় দাঁড়িয়ে পুরো জামাত। কাঠ, খড় আর বেড়ার বুননে দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহর ঘর। জামাত মসজিদে সামানা রেখেই বেরিয়ে পড়ল খুসুসী গাশতে। দ্বীনের বড় আলেম-উলামা, কাজের বড় পুরোনো সাথি আর দুনিয়ার বড় মাতব্বর গোছের লোকের সন্ধানে সাথিরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে পড়ল। এক দলের দায়িত্ব পড়ল ইমাম সাহেবকে খুঁজে বের করা। এদিক-সেদিক খুঁজে দলটি কাউকে না পেয়ে পাশের আবাদি জমিতে নেমে এল। অদূরেই একজন জমিতে কাজ করছেন। মুখে দাড়ি আছে। বুঝা যাচ্ছে মুসলমান। তবে সতরের অবস্থা খুবই নাজুক। গ্রামের ভাষায় যাকে বলে 'মালকাছা' মেরে কাজ করছেন। সাথি দুজন এক-পা দু-পা করে কাছাকাছি গিয়ে জোরে সালাম দিলেন। সালামের আওয়াজে মুরুব্বি জবাব দিয়ে উল্টা সালাম দিলেন। এটাই বোধহয় এই এলাকার নিয়ম। টুপি পাঞ্জাবী পরিহিত দুজন অচেনা লোককে দেখে লোকটি কাছা খুলে সতর ঢাকতে ঢাকতে এগিয়ে আসলেন। কাছে আসতেই আরেক দফা সালাম ও মুসাফাহা হলো। এক সাথি নিজেদের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইলেন, মসজিদের ইমাম সাহেব কোথায়।

মুরুব্বি বললেন, 'আমিই এই মসজিদের ইমাম। বলেন কী বলবেন।' শুনে তো সাথি দুজনের আক্কেলগুড়ুম! বলে কী মুরুব্বি? উনি মসজিদের ইমাম? ইমাম সাহেবের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে মুসুল্লীদের কী অবস্থা? এই চিন্তা করে দুজনই শিউরে উঠলেন।

মসজিদে এসে সাথি দুজন আমীর সাহেবকে কারগুজারি শোনালেন। কারগুজারি শুনে আমীর সাহেব একটি ঘটনা বললেন।

এক লোকের দূরে কোথাও সফরে গিয়ে হঠাৎ তেল কেনার প্রয়োজন দেখা দিলো। তিনি গ্রামের একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই গ্রামে তেল বিক্রি করে কে? লোকটি দূরের একটি বাড়ি দেখিয়ে বলল, ওই বাড়ির লাল মিয়া তেল বিক্রি করে। লোকটি সেই বাড়ির কাছে গিয়ে লাল মিয়ার নাম ধরে ডাকাডাকি করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর এক লোক বেড়িয়ে এল। গায়ের রং কুচকুচে কালো।

বলল, 'কী চান?'

'এই বাড়িতে লাল মিয়া কে?'

'আমিই লাল মিয়া। কী হয়েছে বলেন।'

'বলেন কী? এই গ্রামের লাল মিয়াই যদি এত কালো হয়, তাহলে কালা মিয়া কত কালো?'

৭. মাকসাদ!

২০০৫ সাল। ভোলা সদরের এক নিভৃত পল্লি। মহল্লার মসজিদে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ডেরা ইসমাইল খান এলাকা থেকে পাঠানদের এক জামাত এসেছে। জামাতে পাকিস্তানি সাথি পাঁচজন। তাদেরই একজন মীর জাল খান। বয়স ৭৪। বয়সে মুরুব্বি হওয়ায় জামাতের সাথিরা স্থানীয় রীতি মেনে তাকে 'আগা' সম্বোধন করেন। যার অর্থ বয়স্ক মুরুব্বি বা নেতা। এই আগা যৌবনে পাকিস্তান আর্মিতে সৈনিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশমুখী পাক সেনাদের অপেক্ষমাণ তালিকায় ছিলেন তিনি। যুদ্ধ আর কিছুদিন গড়ালেই অস্ত্র হাতে এ দেশে আসতেন। তার আগেই সব শেষ। আত্মসমর্পণ করে তল্পিতল্পা গুটিয়ে পাক বাহিনীর বিদায়।

যৌবনে অস্ত্র হাতে ঘাতক হয়ে যে দেশে আসার অপেক্ষায় ছিলেন, বার্ধক্যে সে দেশে এলেন তিনি তাসবীহ হাতে। জুলুমের হুকুমনামা নিয়ে জালিম হিসেবে নয়। দাওয়াতের হিদায়াতনামা নিয়ে দাঈ হিসেবে। এসব ভাবতেই তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। কুদরতের কারিশমা তাকে শুকরিয়ার সিজদা দিতে উদ্‌গ্রীব করে তোলে।

এক বিকালের ঘটনা। ওমুমী গাশতের পর অল্প সময় খুসুসী গাশত হবে। দুনিয়ার বড় একজন নেতার কাছে গাশতের জামাত যাবে। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। ৭১-এ পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা অসীম সাহসের লড়াকু মানুষ।

জামাতের আমীর সাহেব ফাইসালা করলেন, 'মীর জাল খান অর্থাৎ আগা যাবেন গাশতে।'

জামাতের সাথে থাকা বাংলাদেশি মুতারজিম (অনুবাদক) অবশ্য হালকা আপত্তি জানালেন। কিন্তু পাঠানের এক জবান, আগাই যাবে। বুড়ো দিয়ে বুড়ো শিকার করতে হবে।

কমান্ডারের বাসায় রাহবারসহ তিনজনের জামাত। পরিচয়-পর্ব সেরে দাওয়াত দেওয়া হলো। কমান্ডার সাহেব মনোযোগ দিয়ে কথা শুনলেন। মসজিদে আসার ও সুযোগ করে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার নিয়্যাত করলেন।

দাওয়াতের কাজ শেষ। জামাত মসজিদে ফিরবে। কমান্ডার সাহেব বাধ সাধলেন। বিদেশি মেহমান নিয়ে এসেছেন। তাও আবার আল্লাহর রাস্তার মুসাফির। খালিমুখে ফিরে গেলে আল্লাহ নারাজ হবেন। সামান্য চা-নাশতা না খেয়ে কোনোভাবেই যাওয়া যাবে না। তা ছাড়া ঘরের মহিলারাও এতে মারাত্মক নাখোশ হবেন।

চা-নাশতা চলে এল। চা খেতে খেতে আগা বললেন,

দেখো ভাই, আজ থেকে ৩৪-৩৫ বছর আগে আমাদের মাকসাদ তথা উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়া। আমরা পাকিস্তানীরা চিন্তা করছিলাম এই বাংলাদেশ আমাদের অংশ। এটা আমরা আলাদা হতে দেব না। মানুষ মরে মরুক। জমিন চাই।

তোমরা চিন্তা করেছিলে, এই দেশ, এই ভূমি আমাদের। এখানে আমাদের ঠকিয়ে সেই পাকিস্তান থেকে লোকজন এসে ফায়দা লুটবে তা হবে না। আমরা এই জুলুম মানব না। আমরা আমাদের ভূমির মালিকানা ও কর্তৃত্ব চাই।

শুরু হলো লড়াই। একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে সংহারক হয়েই আমরা থেমে যাইনি। দুআ, নামাজ, সদকা, রোজা ও মান্নতের মাধ্যমে একে অপরের ধ্বংস কামনা করেছি। বদদুআ করেছি। পাকিস্তানের ঘরে ঘরে মা-বোনেরা, মসজিদে মুসল্লীরা, মাদরাসায় তালিবুল ইলমগণ আর খানকায় সূফীগণ তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়েছেন।

এই দেশেও মজলুম মানুষজন, মা-বোনেরা, ইমাম, আলেম, বুযুর্গ ও নাবালেগ শিশুরা বিভিন্ন ইবাদাতের মাধ্যমে পাকিস্তানের ধ্বংস কামনা করেছে। আমাদের পরাজয় কামনা করেছে।

দুনিয়া এমনই। দুনিয়া যখন মাকসাদ হয়, ভাই তখন ভাইয়ের বিরুদ্ধে ইবাদাত ও আমালের মাধ্যমে বদদুআ করতে থাকে।

অথচ আজকে ৩৪-৩৫ বছর পর। আমি সাবেক পাকিস্তানি সৈন্য। আপনি মুক্তিযোদ্ধা। আজকে আমরা যখন দ্বীন ইসলামকে মাকসাদ বানিয়ে একে অপরের সাথে মিলিত হলাম। এখন আপনি আমাকে চা-নাশতা না করে যেতে দেবেন না। আল্লাহর রাস্তার মেহমান খালিমুখে ফিরে গেলে আপনার ঘরের মা-বোনেরা নারাজ হবেন। এমনিভাবে আমাদের মা-বোন আর মেয়েরাও আমাদেরকে এ দেশে পাঠানোর সময় বাদাম, কিসমিস, চানাচুর, চা-পাতা ইত্যাদি দিয়ে দিয়েছেন। বাংলাদেশের ভাইদের সামান্য মেহমানদারি করানোর জন্য। তারা প্রতি ওয়াক্তে জায়নামাজে দুআ করছে, আপনাদের মধ্যে যেন দ্বীনের প্রতি দরদ জাগে। আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জযবা তৈরি হয়।

এখানেই দ্বীন ও দুনিয়ার পার্থক্য। মাকসাদ দুনিয়া হলে চারিদিকে সর্বনাশ। আর মাকসাদ দ্বীন হলে কিছু সময় পরীক্ষা হবে। তারপরই সফলতা আর মৃত্যুর পর জান্নাতবাস।

চা-নাস্তা শেষ করে উঠে আসার সময় সবার চোখের চিকচিক অশ্রুর আনাগোনা। আল্লাহ তাআলা আমাদের মাকসাদ শুধরে দিন। আমীন!

৮. একটি দরজা এখনো খোলা

সীমান্তঘেঁষা এক গ্রামীণ পথ। পড়ন্ত বিকেলের ক্লান্তিমাখা ব্যস্ততা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার আগেই সবার মাঝে বাড়ি ফেরার নীরব তাড়া। এরই মধ্যে হৈ-হুল্লোড় জুড়ে দিয়ে একটি জটলা এগিয়ে আসছে। স্থানীয় ফাঁড়ির একজন কমান্ডার আর তার একান্ত অনুগত কিছু সৈন্য।

কমান্ডারের পেশিবহুল হাতের মুঠিতে অসহায় এক নারীর দুর্বল বাহু চেপে ধরা। মহিলাটিকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তিনি দরিদ্র-অসহায়, কিন্তু সম্ভ্রমহীনা নন।

কমান্ডারের উদ্দেশ্যও রীতিমতো ভয়ংকর। অসহায় এই নারীর সতীত্ব হরণের দুরভিসন্ধি এঁটেছে সে। স্থানীয় লোকজন অবশ্য বাধা দেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ

হয়েছে। জালিম কমান্ডার আর বেয়াড়া সৈন্যদের কিল-ঘুষিতে উল্টো নিজেদেরই সটকে পড়ার দশা।

শেষ পর্যন্ত অবলা নারীটিকে টেনেহিঁচড়ে নিজের আস্তানায় এনে ছুড়ে ফেলল কমান্ডার।

মহিলাটি দুর্বৃত্তের দুষ্ট ও নোংরা উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে শেষ উপায় হিসেবে রুখে দাঁড়াল।

বলল, ‘তুমি যে অপকর্মের আঁচড় কাটার চেষ্টা করছ, তা আমি হতে দেব না। সম্ভ্রম বাঁচাতে আমি বরং মৃত্যুকে বেছে নেব। ইজ্জত হারানোর তুলনায় মৃত্যু আমার কাছে সহজ।’

কে শোনে কার কথা? উন্মত্ত কমান্ডার ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে দরজাটা আস্তে করে সেঁটে দিলো। মহিলার দিকে এক-পা, দু-পা করে এগিয়ে আসতে লাগল...

মহিলাটি এবার বলে উঠলেন, ‘কমান্ডার সাহেব, আগে তো সব দরজা বন্ধ করুন! একটা দরজা তো এখনো খোলা রয়ে গেছে!’

‘কোন দরজা খোলা? কোথায় কী খোলা?’ এদিক ওদিক তাকিয়ে কমান্ডারের বিস্ময়মাখা প্রশ্ন...

‘আপনার আর আল্লাহর মাঝে যে দরজাটা রয়েছে, তা তো এখনো খোলা রয়ে গেছে! তিনি তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন! সে দরজাটা তো আগে বন্ধ করুন!’

কমান্ডারের মনোজগতে কে যেন এক বিরাট আঘাত হেনে বসল! তার মনে পড়ে গেল, বেশ কিছুদিন আগে সে শুনেছিল, একসময় হয়তো নিজেও পড়েছিল,

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

> ‘তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্ তাআলা তা দেখেন।’[৮]

কমান্ডার যেন অন্ধকার থেকে আলোর দিশা পেল। বুঝতে পারল, এই নারীর সাথে তার অসভ্য কামনা চরিতার্থ করা সম্ভব নয়।

[৮] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ০৪

হুজুর বাড়ি চলে গেলেন। দুষ্টু শিষ্যরা নামল 'মিশন বাতাসায়'।

পাশের পশু-হাসপাতাল থেকে জোগাড় করা হলো ইয়া বড় ইনজেকশন। একটা বড় সুইয়ের আগা গরম করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ছিদ্র করা হলো বাতাসার কৌটার তলদেশ। সেই ছিদ্র দিয়ে বড় ইনজেকশ দিয়ে পানি ভরা হলো কৌটায়। বেশ কিছুক্ষণ পানি ভরার পর ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে এবং নেড়েচেড়ে গুলিয়ে ফেলা হলো সব বাতাসা। এবার বের করার পালা। কিন্তু বিধিবাম! ওইটুকু ছিদ্র দিয়ে ঘন সে তরল বের হতে চায় না। অগত্যা ইনজেকশন দিয়েই ধীরে ধীরে বের করা হলো তরল বাতাসা। এবার আর খেতে সমস্যা হলো না। গ্লাসে করে ভাগাভাগি করে খাওয়া শেষ। শূন্য কৌটা চলে গেল আগের জায়গায়।

চাঁদপুর হুজুর বাড়ি থেকে ফিরলেন। হাতের কাজকর্ম সেরে মুড়ির টিন থেকে মুড়ি নিয়ে বাতাসার কৌটা হাতে নিলেন। নিয়েই কেমন যেন হালকা হালকা অনুভব করলেন। কপালে কিঞ্চিৎ চিন্তার ভাঁজ পড়ল। ময়দার খামির উঠিয়ে কৌটার মুখ খুলে তো হুজুরের চক্ষু ছানাবড়া!

এটা কী হলো? এমন সিলমোহর মারা কৌটার মুখ অক্ষত রেখে বাতাসা কোথায় গেল? ভিতরে একটা বাতাসাও নেই। আছে শুধু ছোপ ছোপ গলিত বাতাসার ছাপ! এটা কীভাবে সম্ভব? অনেক ভেবেচিন্তে কোনো কূল-কিনারা না পেয়ে হুজুর যখন কৌটাটা যথাস্থানে রাখতে যাবেন, ঠিক তখন চোখে পড়ল তলদেশের ছোট ছিদ্রটি। হুজুর আন্দাজ করতে পারলেন, কিছু একটা ঘটেছে। কেউ একজন একটা কাণ্ড ঘটিয়েছে।

পরদিন ক্লাস চলছে। হুজুর আসলেন, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আসলে আমাদের ছাত্ররা যে 'হিকায়াতুল লতীফ' পড়ে এসেছে তা আমার মাথায় রাখা উচিত ছিল। তা ছাড়া সামান্য কয়টা বাতাসার ব্যাপারে এতটা কঠোর না হয়ে তোমাদের দিয়ে গেলে পারতাম। যাক শিক্ষা হলো। কোনো এক মানব জীন চালান দিয়ে সব বাতাসা গায়েব করে দিলো। আল্লাহ সবাইকে মাফ করেন।

২০০৫ সাল। হুজুর কাকরাইলে এসেছেন। চিল্লায় যাবেন। সেই দুষ্টু ছাত্রদের মাষ্টারমাইন্ড তখন কাকরাইলে। এক বছরের জন্য তাবলীগে বের হয়েছে। হুজুরকে পেয়ে কুশল বিনিময় করে সেদিনের ঘটনার দায় স্বীকার করে নিল।

হুজুর মুচকি হেসে বললেন, 'আমার প্রবল ধারণা ছিল ঘটনাটা তুমি ঘটিয়েছ। কিন্তু আমার লোভ আর অতিচালাকির জন্য এবং সামান্য কিছু বাতাসার জন্য আমি বিষয়টা বড় করতে চাইনি। তদন্ত করে বের করলে তোমাকে শাস্তি দিয়ে বহিষ্কার করা হতো। আমি সেটা চাইনি।'

- আসলে দিনশেষে উস্তাদ উস্তাদই থাকে। ছাত্র থাকে ছাত্রের জায়গায়।
- উল্লেখ যে, 'হিকায়াতুল লতীফ' নামক ফার্সি কিতাবটিতে নানা কলা-কৌশলের ঘটনাসহ বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে।

৪. পড়বি তো পড় হুজুরের ঘাড়ে।

১৯৮৯/৯০ এর ঘটনা। পুরান ঢাকার এক বড় মাদরাসায় পড়ি। এক ব্যবসায়ী বেশ কয়েকটা টিনের বাক্স ভর্তি শনপাপড়ি জাতীয় কিছু একটা হাদিয়া দিলো। সব টিনের বাক্স মাদরাসার অফিস রুমে রাখা হলো। একটা টিনের বাক্স খুলে হুজুররা হয়তো টেস্ট করেছেন। ছাত্রদের কয়েক দিন পর দেয়া হবে।

এর মধ্যে একদিন জোহরের পর খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই যার যার ক্লাসে। আমাদের বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজির শিক্ষক অনুপস্থিত। ছাত্ররা ওপরে নিচে চক্কর দিচ্ছে। এর মধ্যে এক ডানপিটে ছাত্রের নজরে পড়ল, অফিসের দরজা খোলা। ভিতরে দফতরের হুজুর ডেস্কের সামনে বসে খাটের সাথে হেলান দিয়ে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন। কিন্তু ঘটনা সেটা না। ঘটনা হলো শনপাপড়ির টিন খোলা। ছাত্রটি পা টিপে টিপে ঢুকে বাক্স থেকে মুঠোভরে শনপাপড়ি নিয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে বেরিয়ে এল। তার দেখাদেখি আমরা কয়েকজনও এই কাজ শুরু করলাম। সাঁই করে ঢুকে মুঠো ভরে শনপাপড়ি নিয়ে এক ছুটে বাইরে। থেমে থেমে এই অভিযান চলতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ বিপত্তি বাধল। এক ছাত্র মুঠো ভরে শনপাপড়ি নিয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে বেরিয়ে আসার সময় আরেকজন সাঁই করে ঢুকে গেল। ভিতরের জনের সাথে বাহিরের জনের কলিশনে একজন ছিটকে বাইরে এসে পড়ল। আরেকজন ছিটকে গিয়ে হুজুরের ওপর। হুজুর হকচকিয়ে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, তার সামনে এক নাবালক চিতপটাং হয়ে পড়ে আছে। রুম ভর্তি শনপাপড়ি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে!

চোখ কচলে হুজুর যখন ঘটনা বুঝতে পারলেন, হেসে গড়াগড়ি খাওয়ার জোগাড়। মুহতামিম সাহেবকে ঘটনা জানানো হলো। তিনি সকল অপরাধীকে ৫০ বার করে কান ধরে উঠবস করিয়ে বিকেলে শনপাপড়ি বিতরণের আদেশ জারি করলেন।

৫. মাইকে কথা কয় কে?

২০০০ সালের রমজান মাস। আমরা তখন তাবলীগের চিল্লার জামাতে। নীলফামারীর চওড়া বড়গাছা ইউনিয়নে। তখন রমজান হতো শীতকালে।

নীলফামারীর কঠিন শীতে আমাদের সফর চলছে। তো ওই এলাকার মানুষ রাত দেড়টা-দুইটায় উঠে সাহরি খেয়ে আবার ঘুমিয়ে যায়। স্বাভাবিক সময়ে উঠে ফজরের নামাজ পড়ে। কিন্তু আমরা চারটার দিকে উঠেই খাওয়া-দাওয়া করতাম।

জামাত চলতে চলতে একপর্যায়ে গিয়ে উঠল চওড়া বাজার মসজিদে।

মসজিদের ইমাম সাহেব আমাদের পেয়ে খুশি। তারাবীহর পর তিনি আমার কাছে এসে বললেন, 'ছোট ভাই, তুমি তো মাদরাসায় পড়ো, আমার একটা উপকার করতে পারবে?'

বললাম, 'বলেন, কী করতে হবে?'

ইমাম সাহেব বললেন, 'আসলে রাতে লোকজনকে ডাকতে হয় বলে আমি বাসায় যেতে পারি না। আজকে যদি তুমি একটু ডেকে দাও, তাহলে আমি বাসায় যেতে পারতাম।'

বললাম, 'কোনো সমস্যা নেই। আপনি বাসায় যান। আমি সময়মতো ডেকে দেব। আযান দেব। নামাজও পড়িয়ে দেব।'

ইমাম সাহেব খুশি হয়ে চলে গেলেন।

রাত ১:১৫। আমি মাইকের মাউথ স্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি শুরু করলাম। দুই চার মিনিট ডাকার পরই শীতে কাবু হয়ে গেলাম। ভাবলাম, শুধু শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে না ডেকে মাউথপিসটা খুলে কম্বলের নিচে শুয়ে শুয়ে ডাকি।

অবস্থা, ন্যূনতম চাহিদা, দ্বীনের পরিবেশ এবং আখলাক ও মানসিকতার ব্যাপারে কোনোরকম গোপনীয়তা রাখা যাবে না।

২. বিয়ে হবে শতভাগ সুন্নাহসম্মত পদ্ধতিতে। কোনোরকম রসম-রেওয়াজকে পাত্তা দেয়া যাবে না।

৩. উভয়পক্ষ উভয়পক্ষকে সর্বোচ্চ ছাড় দেয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। আর তা সবদিক থেকে।

৪. মোহরানা ও ওয়ালিমায় সাধ্যের বাইরে যাওয়া যাবে না। একজন পুরুষের যতটুকু মোহরানা দেয়ার সামর্থ্য আছে তিনি তেমন পাত্রী খুঁজবেন। একজন নারীও এ ব্যাপারে নিজের খাহেশাত ছেড়ে তাকওয়া ও জরুরতের দিকটা প্রাধান্য দেবেন। মনে রাখতে হবে, ব্যতিক্রম কখনোই সাধারণ উদাহরণে পরিণত হতে পারে না।

এসব দিক বিবেচনায় রাখলে বিয়ে ইনশা আল্লাহ সহজ হয়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান দ্বীনদার ভাই ও বোনেরা অন্যান্যদের সাহায্য সহযোগিতা করতে পারেন।

অর্থনৈতিকভাবে বিয়ের প্রাথমিক খরচ তথা প্রয়োজনীয় মোহর ও ওয়ালিমার ক্ষেত্রে সাহায্য করা যেতে পারে। অনেক ভাই আছেন, যারা সংসারের নিত্যকার খরচটা মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু বিবাহকালে এককালীন খরচটা জমা করতে পারেন না। তাদের বিয়েতে মোহরানা ও ওয়ালিমায় আর্থিক সাহায্য দোষের কিছু নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মোহরানা ও ওয়ালিমায় আর্থিক সহযোগিতা করে বিয়েতে উৎসাহ জোগানোর উদাহরণ রয়েছে। যেমন :

১. রবিআহ ইবনু কাআব আসলামী রা.-কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের জন্য উৎসাহিত করেন। তার বিয়ের জন্য বুরাইদাহ আসলামী রা.-কে মোহরানার জন্য কিছু স্বর্ণ জোগাড় করে দিতে বলেন। আম্মাজান আয়িশা রা.-কে ওয়ালিমার জন্য কিছু খাবারের বন্দোবস্ত করতে বলেন।[১৫]

[১৫] মুসতাদরাকু হাকিম : ২৭১৮। সনদে দুর্বলতা রয়েছে। তবে ঘটনা ব্যাপক প্রসিদ্ধ।

২. আলী রা.-এর বিয়েতে সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রা. একটি বকরির ব্যবস্থা করেন এবং সাহাবীগণ বিভিন্ন বস্তুর জোগান দিয়ে ওয়ালিমার আয়োজন করে দেন।[১৬]

৩. বিলাল রা.-এর বিয়েতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু স্বর্ণ দিয়ে তা বিক্রি করতে বলেন এবং সাহাবীদের বলেন, 'তোমাদের ভাইয়ের ওয়ালিমাতে সহযোগিতা করো।'[১৭]

৪. সাহাবী জুলায়বিব রা.-এর বিয়েতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সার্বিক ভূমিকা রাখেন।[১৮]

৫. অর্থাভাবে থাকা এক সাহাবীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু কুরআনের ইলমের বরকতে বিয়ে করিয়ে দেন। উক্ত সাহাবীকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে একটি লোহার আংটি হলেও জোগাড় করতে বলেন। কিন্তু দ্বীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এই দুনিয়াহীন সাহাবীর কাছে কেবল একটি লুঙ্গি/চাদর ছিল। সে ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ ব্যবস্থা এই ছিল যে, কুরআনের আয়াতই ছিল ওনার বিয়ের মোহরানা।[১৯]

সর্বোপরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> مَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا اللهَ لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ
>
> 'যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার (উত্তম কিছু সহ আগমন) করে, তোমরা বিনিময় দাও। যদি বিনিময় দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে তবে তার জন্য (এই পরিমাণ) দুআ করতে থাকো, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার যে, তোমরা তার বিনিময় দান করেছ।'[২০]

বিয়েশাদিতে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় লক্ষ রাখা চাই। যেমন :

---

[১৬] মুসনাদু আহমাদ : ২৩০৩৫। হাসান।

[১৭] মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বাহ : ১৭১৬১। মুরসাল।

[১৮] মুসনাদু আহমাদ : ১৯৮১০। সহীহ।

[১৯] সহীহ বুখারী : ৫০৮৭; সহীহ মুসলিম : ১৪২৫।

[২০] সুনানু আবি দাউদ : ৫০১৯। সহীহ।

পাত্র

১. পাত্রকে পূর্ণ দ্বীনদার হতে হবে। পর্দা ও গাইরে মাহরামের ব্যাপারে কঠোর হতে হবে।

২. পরিবারের মধ্যে দ্বীনের বুঝ থাকতে হবে। পর্দার বিষয়টি বুঝতে হবে।

৩. পাত্র ও তার পরিবারকে নির্লোভ হতে হবে। মেয়ের বাড়ি থেকে আগে বা পরে কোনোরকম দাবি-দাওয়া বা আশা-আকাঙ্ক্ষার মানসিকতা থাকতে পারবে না।

৪. পাত্রকে হালাল ও হারাম বুঝতে হবে।

৫. পরিশ্রমী হতে হবে।

৬. পরিবারের দায়িত্ব বুঝতে হবে।

পাত্রী

১. দ্বীনদার হতে হবে।

২. পর্দা ও গাইরে মাহরামের ব্যাপারে কঠোর হতে হবে।

৩. দ্বীনের জন্য দুনিয়াবী খাহেশাতকে ত্যাগ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

৪. অল্পে তুষ্টি থাকা চাই।

৫. সংসারের কাজ সামলানোর মানসিকতা থাকতে হবে।

৬. সকল বিষয়ে দ্বীনকে প্রাধান্য দেয়ার সদিচ্ছা থাকতে হবে।

উপরি-উক্ত বিষয়গুলো না থাকলে বিয়েতে সহযোগীদের পরবর্তী সময় নানা ঝামেলা আর দেন-দরবার সইতে হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য দ্বীনের পথে অটল থাকা সহজ করে দিন। আমীন।

৩. দাম্পত্য জীবনে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নিজের দায় বুঝা।

বছর দুয়েক আগের কথা। আমি তখন টিকাটুলি নুরে শেফা মসজিদে জুমআর খতীব। প্রতি শুক্রবার সকালে উত্তরখান থেকে চলে যাই। জুমআ পড়িয়ে, খাওয়া-দাওয়া সেরে, খিলগাঁও এসে ভাই-বেরাদারের সাথে গাল-গপ্পো করে

বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত ১১/১২ টা বেজে যায়। আমার আহলিয়া নিজেও পুরান ঢাকার সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা মানুষ, রাত ১২ টার আগে ঘুম তো দূরের কথা, খাওয়া-দাওয়াই হয় না।

কিন্তু এক রাতে সব গোল পাকিয়ে গেল!

আমার ফিরতে ১২:৪৫ এর মতো বেজে গেল। নিচে দাঁড়িয়ে বাসায় কয়েকবার ফোন করলাম। ধরে না। পরে বাড়িওয়ালাকে ফোন করে চাবি নিয়ে গেট খুলে ঢুকলাম। চাবি ফিরিয়ে দিয়ে বাসার দরজায় এসে ডাকাডাকি, দরজা ধাক্কাধাক্কি আর ফোনের পর ফোন করতে লাগলাম। কোনো সাড়া নেই। এতদিন যাবৎ প্রয়োজন মনে না করায় কলিংবেলও লাগাইনি।

একদিকে গরমের দিন। আমার আহলিয়া ফুল স্পিডে ফ্যান ছেড়ে রুমে ঘুমাচ্ছেন। তার ওপর পর্দার কড়াকড়ির কারণে রুমের দরজায়, ডাইনিং স্পেসে আর মূল দরজার সামনে পর্যন্ত তিন চার জায়গায় পর্দা লাগানো থাকায় আওয়াজ ভিতরে যাচ্ছে না। কোনো এক কারণে বেচারির মোবাইলও সেদিন সাইলেন্ট!

সিঁড়ি ঘরের গরম, নানা টেনশন আর বিরক্তিতে আমার প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে। শরীর বেয়ে দরদর করে ঘাম বেরোচ্ছে।

মনের মধ্যে নানা রকম চিন্তা চলছে। একবার ভাবলাম, দরজা খোলার সাথে কষিয়ে একটা থাপ্পড় দেব! আবার ভাবি, জীবনে হাত তুলিনি, আজ কীভাবে সম্ভব!

তা ছাড়া আব্বা বলে গেছেন, যে পুরুষ অন্যায় ও তুচ্ছ কারণে বৌয়ের গায়ে হাত তোলে, তার বীরত্ব দেখানোর কোনো জায়গা আর বাকি থাকে না। সে হলো কাপুরুষ।

তাই ভাবি, না, হাত তোলা যাবে না।

আবার ভাবি, কঠিন একটা ধমক দেব!

পরে আবার ভাবি, বেচারির কী দোষ! সে তো আর ইচ্ছা করে দরজা না খুলে বসে নেই। তাই ধমক দেয়াও ঠিক হবে না। তা ছাড়া দেরিতে এসে প্রথম ভুলটা আমারই হয়েছে।

অতএব, ধমক বাদ। ধমক দেয়া যাবে না।

আবার ভাবি, দরজা খোলার সাথে সাথে তার মোবাইলটা একটা আছাড় মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলব। পরে আবার ভাবি, ভাঙলে পরে আমারই আরেকটা কিনে দিতে হবে।

রাগ আর বিরক্তি একবার ওঠে, একবার নামে। কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করি, কিছুক্ষণ সিঁড়িতে বসে জিরাই। এভাবে চলতে চলতে ২:২৭ এর দিকে উনি উঠলেন। আওয়াজ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?'

বললাম, 'আমি। দরজা খোলো।' আর সাথে মনে মনে বলতে লাগলাম, আল্লাহ, দরজা খোলার পর আমাকে শান্ত থাকার তাওফিক দিয়েন।

উনি এসে দরজা খুললেন। খোলার সাথে সাথে আমি সালাম দিয়ে ঢুকেই বাথরুমে চলে গেলাম। যাতে এই বিষয়ে তৎক্ষণাৎ কোনো কথাবার্তা না হয়। বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে বের হওয়ার পর উনি জানতে চাইলেন, 'এত রাত করলেন যে আসতে?'

বললাম, 'আসছি তো আরও দেড় ঘণ্টারও বেশি আগে। কিন্তু তোমাকে ডেকে উঠাতে পারিনি।'

পরে বেচারি নিজেও বেশ লজ্জিত হয়েছে। মাফ চেয়েছে। আফসোস করেছে।

অথচ ঢুকেই কোনো কাণ্ড ঘটালে মাঝরাতে হয়তো তর্ক হতো, কথা কাটাকাটি হতো, ঝগড়া হতো। অশান্তি হতো।

মূলত সংসারজীবনে কোনো সমস্যা দেখা দিলে কিছু করণীয় আছে। যেমন :

১. যেকোনো দাম্পত্য সংকটে প্রথমেই বেশি বেশি ইসতিগফার পাঠ করা। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পাঠ করা। দুরুদ পাঠ করা।

২. প্রথমেই এর পেছনে নিজের দায় আছে কি না তা খতিয়ে দেখা চাই। নিজের কোনো দায় থাকলে নিজেকে দায়ী করে সমাধানের পথ খোঁজা চাই।

৩. নিজের কোনো দায় না থাকলে অপরজনের ভুল বা দায়ের পরিমাণ খুঁজে বের করা। সামান্য হলে হালকা মেজাজে এর সমাধান করা।

৪. অপরজনের ভুল বা দায়টুকু গুরুতর হলে দেখতে হবে এটা ক্ষমার যোগ্য কি না? সহজ সমাধান আছে কি না? থাকলে সে পথে যেতে হবে।

৫. যদি সমস্যা ক্ষমার অযোগ্য ও জটিল হয়, তাহলে তড়িঘড়ি সমাধানের পথ না খুঁজে ভেবেচিন্তে ও একান্ত আপন মুরুব্বি ও বিজ্ঞজনদের সাথে পরামর্শ করে সমাধান খোঁজা।

৬. দাম্পত্য জীবনের যেকোনো সংকটে পেছনের সময়টুকুতে একের জন্য অপরের ত্যাগ, ভালোবাসা ও নিবেদনের বিষয়টি মাথায় রাখা।

আল্লাহ সবাইকে সুন্দর দাম্পত্য জীবন দান করুন।

৪. মাইনের টাকা বউয়ের হাতে! বোকামি নাকি চালাকি?

আমরা যে নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবার এবং সমাজে বেড়ে উঠে এখনো জীবন-যাপন করছি তার অনেক রং, রস ও রূপ রয়েছে।

এসবের অন্যতম একটি হলো ঘরের কর্তার মাইনের টাকা বা সারা মাসের উপার্জন।

এই টাকাটা সাধারণত তিন পদ্ধতিতে বণ্টন ও ব্যয় করা হয়।

১. কর্তা মাসের সব বাজার বাকিতে করেন। বেতন পেয়ে সামান্য হাতখরচা রেখে বাকি সব টাকা মুদি দোকান, সবজিওয়ালা, ফার্মেসি, দুধওয়ালা আর ভাড়া ও বিল-বাট্টায় বিলিয়ে দিয়ে বসে থাকেন। এতে বাকির খাতা একটু একটু করে লম্বা হয়। বছর শেষে বোনাস আর এদিক-ওদিকের বাড়তি কিছু আয় দিয়ে তা শেষ করতে হয়।

২. কর্তা সব টাকা নিজের পকেটে রাখেন। বাসার যখন যা লাগে, এনে দেন। বাসার লোকজন তার আয়-রোজগার, ব্যয়ের পরিমাণ আর চলমান অবস্থা সম্পর্কে তেমন খোঁজখবর রাখে না। রাখতে চায়ও না। তারা শুধু তাদের প্রয়োজনটুকু জানান দিয়ে অপেক্ষায় থাকে।

৩. কর্তা তার নিজের হাতখরচা রেখে বাকিটা গিন্নির হাতে তুলে দেন। গিন্নি মাথা খাটিয়ে সেই টাকায় মাস পার করেন। এ ক্ষেত্রে কর্তার চেয়ে গিন্নির টেনশনটা থাকে বেশি।

এবার আসি আমার অভিজ্ঞতায়।

মোটামুটি বুঝ হওয়ার পর একটা সময়ে এসে খেয়াল করলাম, আব্বা তার উপার্জনের সব টাকা আম্মার হাতে তুলে দিচ্ছেন। প্রতিদিন বাজারে যাওয়ার সময় আম্মার কাছ থেকে বাজারের লিস্ট আর টাকা নিয়ে যান। বাজার শেষে ঘরে ফিরে হিসেব করে বাকি টাকা ফিরিয়ে দেন।

আমাদের বাসায় এখনো আমার দুই ভাই মাসের আয়-উপার্জন থেকে ব্যক্তিগত হাতখরচের টাকা রেখে বাকিটা আম্মার হাতে তুলে দেন। আমি আলাদা ও দূরে থাকি বলে এই নিয়মের বাইরে আছি।

তবে বাসায় আমি বউয়ের হাতে টাকা-পয়সা তুলে দিই না। চাইলে দিই।

ছোটকালে আব্বার সবকিছুই আমার ভালো লাগলেও এই বিষয়টা ভালো লাগত না। চিন্তা করতাম, পুরুষ মানুষ টাকা কামাবে, পকেটে নিয়া ঘুরবে, একাউন্টে রাখবে, খরচ করবে। বউয়ের হাতে টাকা দিতে যাবে কেন? বউকে হিসাব দিতে যাবে কেন?

কিন্তু চল্লিশ বসন্তের দোরগোড়ায় এসে বাপজানের সেই সিদ্ধান্তকে এখন বড় বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হচ্ছে।

যখন উপার্জনের টাকা নিজের পকেটে থাকে তখন বাসার লোকজনের কাছে মাসের শুরু আর শেষ বলে কিছু থাকে না। ব্যাপারটা অনেকটা 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' পর্যায়ে চলে যায়। যখন তখন ফোন করে বলবে, আসার সময় এইটা নিয়া আইসেন। ছেলে ফোন করবে, মেয়ে ফোন করবে। এটা-ওটা লাগবে। এনে দিতে হবে। কীভাবে আসবে তা জানার দরকার নেই। আর বড় কিছু হলে আগে মায়ের কানে দেবে। মা এসে বাপের কানে দেবে। টাকা নেই বললে বলবে, 'আমরা চাইলেই আপনার টাকা শেষ হয়ে যায়!'

আর আব্বা যখন আম্মার হাতে টাকা তুলে দিত। তখন আম্মার সামনে পুরো মাস টেনে নেয়ার চিন্তা থাকত। কোথায় খরচ না করলেই নয়, কোন জিনিসটা এ মাসে না হলেও চলে, কার কোন আবদার পূরণযোগ্য তা ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে আগাত।

আমি বলছি না, আপনারা বউয়ের হাতে টাকা তুলে দিন। এসব ব্যাপার একেক পরিবারে একেক রকম ফলাফল বয়ে আনে।

আমার বলার উদ্দেশ্য হলো সীমিত আয়ে সংসার চালাতে চাইলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে। এখন আপনার মা বা বউ যদি মধ্যবিত্তের সংগ্রাম দেখে উঠে আসে, তাহলে মাইনের টাকা ওনার হাতে তুলে দেয়া যেতেই পারে।

তবে কেউ যদি মনে করেন, বউয়ের হাতে টাকা তুলে দিলে সংসারে নিজেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়বেন তাহলে এই পথে পা বাড়ানোর চিন্তা না করাই ভালো।

বি. দ্র. এই লেখা আমার মতো নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের লোকজনের জন্য। আপনার মতো উচ্চ বা উচ্চ মধ্যবিত্তের জন্য নয়।

৫. একান্নবর্তী পরিবারে পোশাকের সতর্কতা

একবার আমাদের এক আত্মীয়া তার মেয়ে আর আমাদের এক ভাগনির জন্য একই ধরনের পোশাক ক্রয় করেন। তারা দুজনই আবার একই বাড়ির দুই ছেলের বউ।

বিষয়টি নিয়ে আমার আম্মার বাসায় কিছু আলাপ-আলোচনা হয়। সেখানে কিছু বিষয় উঠে আসে। যেমন :

১. বালেগা মেয়ে আর মা একই ধরনের পোশাক পরবে না। একে অন্যের পোশাক পরবে না।

২. শাশুড়ি এবং বউমা একই ধরনের পোশাক পরবে না। একে অন্যের পোশাক পরবে না।

৩. বাড়ির ছেলের বউয়েরা একই ধরনের পোশাক পরবে না। একে অন্যের পোশাক পরবে না।

৪. কোনো সময় পরিবারের সকল মেয়ে, মেয়ে জামাই, ছেলে ও ছেলের বউরা একত্র হলে প্রত্যেকের পোশাকের রং কিংবা ডিজাইন আলাদা হওয়া চাই।

৫. স্বামী যে পোশাকে স্ত্রীকে দেখতে পছন্দ করেন, তা পুরোনো হয়ে গেলে ঘরের পরিচারিকাকে না দিয়ে বাইরের কাউকে হাদিয়া দেয়া। আর দিলেও স্বামীকে জানিয়ে দেয়া।